গল্প ॥ অবাক কাণ্ড

প্রকাশিত : ১ জুলাই ২০১৬

- **দিলরুবা শাহান**

শব্দ শুনেই চমকে উঠল দীনা। ঘড়ির দিকে তাকাল। সময় দেখে আন্দাজ চাইল পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে ভেসে এলো এই শব্দ। কি খবর শুনবে কে জানে। বেশি রাতে ফোন খুব কমই আনন্দবার্তা নিয়ে আসে। চিন্তিত মন নিয়ে রিসিভার কানে ধরল। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বহুদিন পর ভেসে এলো বহু চেনা গলা।

‘ফুপুমণি...’

‘তুই এতো রাতে কোথা থেকে?’ বকতাকে বয়ান শেষের সুযোগ না দিয়ে ভীত গলায় প্রশ্ন করল দীনা।

‘কেন আমার নিজের ঘরে বিছানায় বসে...’

‘যাক এতদিন পর তোর মন চাইল ফুপুকে ফোন করতে; তা বল কেন ফোন করেছিস’

‘কেন ফুপু গত সপ্তাহে তো দেখা হলো তোমার সঙ্গে, তবু কেন কথা শুনাচ্ছ?’

‘দেখা হলেও কথা হয় না অনেকদিন, তুই নাকি ইউনির ফাঁকে ফাঁকে কাজও করছিস আজকাল? ওপারে গলায় হালকা হাসির আভাস।

‘মা বলেছে বুঝি, মা সারাক্ষণ বিষণœ থাকে আর আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করেই যাচ্ছে, বাইরে গিয়ে বদলোকের পাল্লায় না পড়ি, আচমকা আজগুবি কা- না ঘটাই আরও কতকিছু; শুন আমি আজব কা- করলে বলে কয়েই করব বুঝলে।’

‘বুঝলাম, এখন কেন ফোন করেছিস তা আগে শুনি?’

‘কাল তো শনিবার তোমারও ছুটি তাই না, আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে? কাউকে বলা যাবে না এখন’

‘কোথায় কখন?’

‘সময় বলতে পারি তবে কোথায় যাব বলবো না। তোমাকে কিছু বলার আছে।’

সময় ঠিক করে ফোন রেখেও দুশ্চিন্তা গেল না দীনার। মেয়েটি আমুদে। মেয়েটি রহস্যপ্রিয়। মেয়েটি বড় অচেনা হয়ে উঠে কখনও কখনও, আবার কখনও বড় চেনা। কখনও শান্ত, কখনও চঞ্চল। কি বলতে চায় ও। ওর মাকে নিয়ে যত সমস্যা। অতিরিক্ত চিন্তা করে মা। দীনা ওদের আপন কেউ নয়। তবুও এই বিদেশ বিভূঁইয়ে অনাত্মীয় আত্মীয় হয়ে ওঠে। নিজেকে ওদের আপনজনই মনে হয়। মেয়েটির মা-বাবার সঙ্গে ভাইভাবীর সম্পর্ক তৈরি হওয়াতে মেয়েটি ওকে ফুপু বলে ডাকে। বাবা নাই মেয়েটির। বছর তিনেক আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ভদ্রলোক। তখন স্কুলে ওর শেষ বছর ছিল। পড়াশোনায় ভাল, বক্তা ভাল। স্কুলে বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা সব কিছুতে ছিল ওর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ। বাবা মেয়েটির খুব বড় উৎসাহদাতা ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর মেয়েটির হৈ হৈ রৈ রৈ করা আমুদে স্বভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রহস্যময় কা- করে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের সময় পার করিয়ে সবাইকে হাসির বন্যায় ভাসানোর কায়দাগুলো ভুলে গেছে সে। মায়ের সঙ্গে হাসিখুশিতে সময় ওর তেমন কাটেনি। কারণ মা গম্ভীর ও প্রায়ই অকারণ (নাকি কারণ কিছু আছে?) আশঙ্কায় আক্রান্ত যেন।

একবার স্কুলের বিতর্ক দলের নেতা জেইসনকে বাসায় নিয়ে এসেছিল। মা ভীত হলেন। ভিতরে ভিতরে রেগেও গেলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা সরাসরি কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। পরে স্বামীর কাছে জেইসনের আগমনকে দুশ্চিন্তা করার মতো ঘটনা বলে

বর্ণনা করলেন। বাবা জানতে চাইলেন অশোভন কোন আচরণ চোখে পড়েছে কিনা। যখন শুনলেন তেমন কিছুই ছিল না। তখন বাবা বললেন জেইসনের আসা অন্যায় কিছু নয়। বরং বোঝা যায় ও কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। মার আশঙ্কা তাও গেল না। উনি কাদের কাছে যেন শুনেছেন বাঙালি স্কুলপড়ুয়া কয়েকটি মেয়ে কবে কোথায় কার বুদ্ধিতে যেন রেস্তোরাঁতে গিয়ে মদ চেখেছিল। সেই ঘটনা জানার পর এক মেয়ের মা অসহায় রাগে তিন মাস আপন কন্যার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখেন। মায়ের অসহায় রাগ ও অবহেলা দেখে ঐ মেয়েটির মাঝে এক অপরাধ বোধ জাগে। শোনা গেছে মেয়েটি নাকি মাকে কষ্ট দেয়ার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিল। ঘটনা শুনে আমোদপ্রিয় মেয়েটি মাকে আরও অথৈ চিন্তায় ফেলার জন্য হৈ হৈ করে বলে উঠল ‘আরে মদ চাখেত ইচ্ছে করলে ঘরে বসে খাবো, বাইরে মাতাল হওয়া খুব ছ্যাঁচড়ামি ও ভারি জঘন্য ব্যাপার; তবে এখন পর্যন্ত আমার মদ চাখতে ইচ্ছে হয়নি, যখন হবে বলবো।’

মেয়ের কথা শুনে মায়ের আক্কেল গুড়ুম। বাবা সহজ আনন্দে বিস্মিত গলায় বললেন,

‘দেখেছ আমার মেয়ে কেমন বুদ্ধিমতী! শুন্ মা তোর ইচ্ছে হলে আমাকে বলিস সবার আগে, ভাল আর দামী মদ আনব আর তার সঙ্গে প্রোপার ওয়াইন গ্লাসও কিনতে হবে, আমাদের তো মদ খাওয়ার মতো ওসব কিছু নাইও’ বলেই মাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিল।

মেয়ের জানার আগ্রহ অনেক তাই তৎক্ষণাত প্রশ্নও করল,

‘প্রোপার ওয়াইন গ্লাস কোনটা বাপি?’

‘ঐ মেয়ে বাপের আসকারা পেয়ে সর্বনাশা কোন কা- না জানি করে বসে!’ মায়ের কথাতে থমকে না থেমে বাবা মেয়েকে বিয়ারের গ্লাস, শ্যাম্পেনের গ্লাস ও ওয়াইনের গ্লাস কি রকম তার ইতিবৃত্তান্ত বুঝিয়ে থামলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন,

‘তুমি হয়তো ভাবছো মদের গ্লাস সম্বন্ধে এতো জানার কি দরকার। জানার মাঝে দোষ কিছু নাই। এবার শোন তবে কুরবানীর গরু কি রকম হলে ন্যায়সঙ্গত হয় তা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন আমার এক সজ্জন হিন্দু শিক্ষক। কম বয়সী বাছুর হবে না, গর্ভবতী গাভী কুরবানী করা যায় না। উনার কথা শুনে বড় অন্যায়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের খুব আর্থিক টানাটানি। আমি কলেজে সবে ভর্তি হয়েছি, ছোটভাইটা ক্লাস নাইনে পড়ে। সেবার ঈদে প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য বছরের মতো গরুই কুরবানী দেব ভেবে পাঁচ মাস বয়সের এক

নাদুসনুদুস বাছুর গ্রাম থেকে সস্তায় কিনে আনি। মায়ের আপত্তি না শুনে আমরা দুইভাইয়ে ঐ বাছুরই কুরবানী করবো ঠিক করি। তখন আমাদের হিন্দু শিক্ষক সত্যেন স্যার কথাগুলো বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করার কথা যখন ধর্মে বলা হয়েছে তখন একবছরে বাছুরটিকে পেলেপুষে বড় করে আগামী বছরে ওকে কুরবানী দিয়ে আদরের জিনিস উৎসর্গ করতে পারলে আরও ভাল হবে।' একটু চুপ থেকে স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন বাবা 'শুন এই বয়সে যখন এতোটুকু বুঝেছে যে বাইরের লোকের উস্কানিতে মদ খাওয়ার মতো কাজ হচ্ছে ছ্যাঁচড়ামি তখন ওকে নিয়ে চিন্তা একটু কম কর।'

মেয়ে মাকে বললো,

'মা, যারা অন্যের মেয়েদের কথা তোমাকে বলেছে, তারাই আবার তোমার মেয়ের নামে অন্যদের কাছে বাজে কথা বানিয়ে বলে।'

'তোর মা শুনেই সব কথা বিশ্বাস করে ফেলে; যাচাই করে দেখার বালাই নাই তার।'

বাবার সঙ্গে সহজে সব কথাই বলত। তাই জেইসনকে বাড়িতে ডেকে আনার কারণ বাবাকেই খুলে বলেছিল। ওদের বিতর্কের বিষয় ছিল 'ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একে অন্যেকে মেনে নেয় নাকি অপছন্দ করে'। জেইসন ওদের বাড়ি এসে ওর মায়ের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে এমন সুন্দর যুক্তি বিস্তার করেছিল যে ঐ বিতর্কে ওদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারেনি।

বাবা সবসময় বলতেন নানা মতের নানা জাতের মানুষের পাশাপাশি বাস করতে হলে অনেক সহনশীল হতে হয়। অন্যের প্রতি সম্মান দেখাতে হয়। কথাটার অর্থ তেমন বুঝতো না। সেদিন মায়ের ব্যবহারে বুঝলো সহনশীলতা কাকে বলে। বাড়িতে বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ভিনদেশী একজন হাজির। মায়ের কাছে একদম পছন্দনীয় বিষয় নয়। তবুও রসকসহীন মায়ের জেইসনের প্রতি ভদ্র ব্যবহার দেখে মেয়েটি বিস্মিত।

মা'র অপূর্ব সহনশীলতায় মেয়েটি খুশি হয়েছিল তা বাবাকে জানাতে ভুললো না। বাবা বলেছিল 'তুই তোর মাকে বুঝতে চেষ্টা করিস, ওর কিছু কষ্ট আছে যা তোকে বলবো একদিন।' শনিবার এসে গেল। নিঃসন্তান দীনার অনেক কাজের মাঝে জীবন বাঁধা নয়। তাই সকালই ওদের বাড়ি চলে এলো। মেয়েটির মা ওকে দেখে খুশি যেমন হলেন একই সঙ্গে অবাকও হলেন। 'তুমি এতো সকালে! আসো তবে নাস্তা খাই একসঙ্গে।'

‘কেন তুমি জান না ঐ দুষ্টুটা আমাকে আসতে বলেছে, কোথায় যেন যাবে আমাকে নিয়ে?’

‘কোথায়?’ মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন্-

ঠিক ঐ সময়ে পর্দা সরিয়ে মেয়ে হাজির আর হঠাৎ করেই আজ ও যেন আগের মতো কল কল করে উঠলো

‘বলা যাবে না, সারপ্রাইজ!’

‘সারপ্রাইজ!’

মা ও ফুপু দু’জনেরই বিস্মিত উচ্চারণ। যদিও বিস্ময়ের সঙ্গে শঙ্কাও মিশে ছিল। সারপ্রাইজ শব্দটা চিন্তিত করলো তাদের। তারপরও ফুপু বললো,

‘এই পাঁজী মেয়ে তুই আবার কোন ছেলেটেলে পছন্দ করে বসিসনিতো?’

মেয়েটি রহস্যময় এক হাসি মুখে নিয়ে দু’জনকে দেখলো। চা খেতে খেতে ফুপু বললো,

‘তোর মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই চল, একা ছেলে দেখে আমি মতামত দিতে পারবো না।’

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট চেপে মাথা নাড়িয়ে ফুপুর প্রস্তাব বাতিল করে দিল। হেসে বললো

‘শোন মা তাকে পছন্দ নাও করতে পারে।’ বলে সে কাপড় পাল্টে তৈরি হতে গেল।

এবার মা বললো

‘সারপ্রাইজ শব্দটা শুনলেই ভয় লাগে,’

‘কেন বলতো?’

দীনার পাল্টা প্রশ্ন

‘ঐ যে বাংলাদেশের কোন এক মেয়ে মা-বাবার চোখ বেঁধে তাদের সারপ্রাইজ দেবে বলে নিজের ঘরে নিয়ে যায়...’

‘হ্যাঁ, বুঝেছি তারপর মা-বাপকে ছুরি মেরে মারতে চায় আর ছুরি খেয়ে মা মারাই যায় তাই তো, তুমি এসব বাজে চিন্তা বাদ দাও তো।’

কথাবার্তার মাঝে মেয়েটি চলে এলো। মাকে বিদায় জানিয়ে ওরা বের হলো।

পথে তেমন কথা হলো না। একটি বড় শপিং সেন্টারে যাওয়ার কথা বললো মেয়েটি। দীনা কৌতুক আর শঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

‘সত্যি করে বলতো তোর পছন্দের কেউ কি এখানে আসবে বলেছে?’

মেয়েটি সামনে রাস্তায় চোখ রেখে ঠোঁটে রহস্যের হাসি নিয়ে নিশ্চুপ রইলো মাত্র। শপিং সেন্টারে পৌঁছে দীনাকে নিয়ে বড় একটা জুয়েলারি শপে ঢুকলো। এবার মেয়েটি ব্যাগ খুলে যতেœর সঙ্গে টিস্যুতে জড়ানো কিছু একটা বের করলো। ডিসপ্লে বাক্সের কাচের উপর টিস্যুর ভাজ খুলে একটি আংটি দীনার কাছে দিয়ে বললো

‘এই মাপের একটি হীরার আংটি পছন্দ করো তো ফুপু’

‘কার জন্য হীরার আংটি?’

‘মা’র জন্য’ কথাটা যখন বলছিল তখন ওর গলায় কোন রহস্য ছিল না, চোখে ছিল কোন সুদূরের কষ্ট মাখানো চাউনি।

‘হীরার আংটির তো অনেক দাম হবেরে’

হোক ফুপু, গত তিন বছরে কাজ করে আমি ভালই পয়সা জমিয়েছি, দাদীর সখের ইচ্ছা বাবা পূরণ করার সময় পায়নি; আজ আমি তা পূর্ণ করতে চাই।’

ওদের পরিবারের সুখদুঃখের খুটিনাটি দীনা জানতো। শুধু এই মেয়ের রহস্য যে কত গভীর তা দীনার জানা ছিল না। কাজ করে পয়সা কিসে উড়ায় তা নিয়েও মেয়েটির মায়ের চিন্তা ছিল সীমাহীন। তবে আজ মেয়েটির অবাক করা কাজটি মা বা ফুপুর কল্পনায়ও ছিল না। আজ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাম কমানোতে প্রায় সাত হাজার ডলার দামের পছন্দের আংটি বেশ কম দাম দিয়েই কেনা গেল। এবার মেয়েটি বললো ‘ফুপু পয়সাতো এখনও ভালই রয়ে গেছে, চল তোমাকে নিয়ে মজার কিছু খাই।’

মেয়েটির আনন্দ পূর্ণ করতে ওরা মোটামুটি সম্ভ্রান্ত খাবার জায়গা বেছে নিয়ে বসল। অনেক গল্প হলো। বাংলাদেশ, বরিশাল কত কথা। বরিশালের কবি জীবনানন্দ

মেয়েটির বাবার প্রিয় কবি কথাটা বলে মেয়েটির চোখ ভিজে উঠল। কবে কোন একদিন বাবা বলেছিল সময় পেলে ঘোর বর্ষায় বরিশালে নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাবে জীবনানন্দের কবিতায় আঁকা ছবির মতো গাছের পাতাকে ছাতা মতো করে পাখিরা কিভাবে বসে বসে দোল খেতে খেতে ঝিমায়। গল্পের এক ফাঁকে ফুপু ওর বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিল। জেইসনের কথাও উঠলো। শুনলো জেইসন ইয়ার ইলেভেনে পড়ার সময়ে ওর মা-বাবা আলাদা হয়ে যায়। ওকে মা বা বাবা কেউ সঙ্গে রাখলো না। তাই জেইসন নানীর কাছে থাকত। তখনি ও স্কুল ছেড়ে দেয়। পরে ইউনিতে ওদের এক আইন পড়ুয়া সহপাঠী জুভেনাইল কোর্টে শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের সময় দেখেছে ছিচকা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে সম্ভাবনাময় ছাত্র জেইসন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। তখন মেয়েটি বললো, 'জান ফুপু এদের সবকিছু এতো লোকদেখানো আদিখ্যেতা যে দেখলে হাসি পায়। দেখনা মা-বাবা পড়াশুনার কঠিন সময়ে জেইসনকে কাছেও রাখলো না। বন্ধুদের মুখে শুনেছি মা-বাবা দুজনে মিলেই জেইসনকে আঠারো বছরের জন্মদিনে ওকে নতুন গাড়ি কিনে দিয়েছিল। বুঝলে ফুপু এ হচ্ছে ভালবাসা না দেওয়ার ক্ষতি পূরণ। মা আমাকে কখনো বলেনি ভালবাসি তোকে বা আমি মাকে বলিনি। তবু জানি কি পরিমাণ ভাল মা আমাকে বাসে। আর আমি... কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগের নৈঃশব্দ নেমে আসলো। নিঃসন্তান দীনা গভীর নিশ্বাস ফেললো। বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো অচেনা জেইসনকে আর মায়ের জন্য ভালবাসায় ভরপুর মেয়েটিকে দীনার হৃদয় উজাড় করা আদর ছুয়ে গেল।

মেয়েটির বাবা-মা অর্থাৎ হিশাম ও মাহীনের বিয়ের কথাবার্তা যখন সবে শুরু হয়েছে তখন মাহীনের বাবা হঠাৎ করে হৃদরোগে মারা যান। মাহীনের শোকাতপ্ত মায়ের অনুরোধে হিশাম উৎসব আয়োজনে সময় নষ্ট না করে বরিশালের পটুয়াখালীতে গিয়ে নিজের মাকে নিয়ে এসে বিনা আড়ম্বরে বিয়ের কাজ সেরে ফেলেন। পিতৃহীনা মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে হিশামের মা স্নেহের চোখে দেখলেও ইংরেজি স্কুলে পড়া উচ্চপদস্থ চাকুরের একমাত্র মেয়ের বিষয়ে একটু যেন দুর্ভাবনাও করলেন। তা পটুয়াখালী টিনের ঘরবাড়ি, টিপকল ও বাঁশের বেড়ার গোসলখানার সাথে শহরের ঝকঝকে সবকিছুর তুলনা করে বিশেষ করে মোজাইক বাথরুম দেখে মনে হলো এই মেয়ে পটুয়াখালীতে গেলে গোসল করবে কিভাবে। যদিও মাহীন নিতান্ত কম বয়সী তবুও হিশামের বিধবা মা হৃদয় খুলে পুত্রবধূকে ভাইবোনের কি কি প্রত্যাশা হিশামের কাছে তা অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলে গেলেন। বলতে ভুললেন না যে হিশামের বড়বোনের বিয়ে আগেই হয়েছে। ছোটবোনের বিয়ে ঠিকই হয়ে আছে শুধু বিয়েতে খরচের টাকা জোগাড়ের অপেক্ষা মাত্র। আর ভাইটি বছর দুইয়ের মাঝে পড়াশোনা শেষ করে ফেলবে তখন হিশাম ঝাড়া হাতপা। শাশুড়ির সরল ভাষণে মাহীনের মনে খুব দরদ জাগল। তখনই

মনে মনে সে ঠিক করল নিজের গয়না থেকে পুরো এক সেট গয়না এখনো না দেখা ননদকে দিয়ে দেবে।

শাশুড়ি এক সপ্তাহ পর ওদের শহরের ছোট বন্ধ বাক্সের মতো ফ্লাট ছেড়ে নারকেল, নিম আর সুপারীর ডালে বাতাস দোল খাওয়া পটুয়াখালীর উঠানপুকুর ঘেরা খোলামেলা বাড়িতে ফিরলেন। শীঘ্রই বউকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলে গেলেন হিশাম।

জামাই হিশাম মাহীর বাবার পারিবারিক এক সজ্জন বন্ধুর বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র ছিল। ধনী না হলেও আত্মসম্মানবোধ প্রখর ছিল হিশামের। কলাবাগানে শ্বশুরের বাড়িতে থাকার বদলে কাছেই ধানমন্ডিতে এক লেখকের বাড়ির গ্যারেজের উপর ছোট দু'কামরার বাসাতে উঠে এসেছিল। লেখকও খুশি। কারণ সপ্তাহে একবার হলেও ওরা লেখকের কিছু লাগবে কিনা জানতে চায়। ঐ দম্পতির খোঁজখবর রাখে। সন্তানেরা কাছাকাছি কেউ না বলে হিশাম-মাহীনের উপস্থিতি বাড়িওয়ালা দম্পতির জন্য যেন এক শক্তি। ভাড়ার চেয়েও ওদের সুব্যবহার ঐ দম্পতির কাছে অনেক মনোরম।

মাসখানেক পর হিশাম মাহীনকে নিয়ে সদরঘাট থেকে সন্ধ্যার লঞ্চ ধরল। কেবিনের সুন্দর ব্যবস্থা। তার মাঝে দুজনে মিলে সবার জন্য টুকটাক উপহার কিনতে পেরে যাত্রার আনন্দ অনেক বেশি যেন ওদের। মাহীনের মা ওদের জন্য পথের খাবার কাবাব, পরোটা ও সুজির হালুয়া তৈরি করে দিয়েছেন। এমন কি বোতলে পানিও দিয়ে দিয়েছেন। উনারা ঢাকার মানুষ। তার স্বামীও ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জের লোক। স্বামীর এক ফুপু ছাড়া তিনকুলে আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। তাই তারা বিদেশ যতো গিয়েছেন ঢাকার বাইরে ততো যাননি কখনোই।

লঞ্চে উঠে মাহীনের আনন্দ আর ধরে না। কেবিনে ঠুকলো বাধ্য হয়ে। যখন জ্যোৎস্না মাখা নদীর ঠান্ডা বাতাসে জ্বর এসে গেল প্রায়। ডেকে দাঁড়িয়ে কত গল্প। কবে হল্যান্ড হয়ে উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে বাবা-মায়ের সাথে ইংল্যান্ডের ডোভারে পৌঁছেছিল। তবে খোলা ডেকে দাঁড়াতে পারেনি বাতাস আর সমুদ্রের ঢেউয়ের ভয়ে।

ওরা পটুয়াখালীতে নামতে নামতে সকাল। ততক্ষণে মাহীনের বেশ জ্বর। পরিকল্পনামতো উপহার দেয়ার আনন্দও ঠিকমতো উপভোগ করতে পারল না। বাড়ির গেট থেকে বারান্দাতে ওঠার মিটার আটদশ লম্বা লাল ইটের কংক্রিট বিছানো তিন ফুটের মতো চওড়া পায়ে চলার পথের দুপাশে সুপারি গাছের সারি। এপাশের পাতাগুলো ওপাশেরগুলোকে জড়িয়ে খিলান বা আর্চের মতো তৈরি করেছে। যা দেখে মাহীন দারুণ

মুগ্ধ। শাশুড়ি ওর মুগ্ধতা দেখে বললেন বছরে বিশত্রিশ হাজার টাকার সুপারি বিক্রি করতে পারি এতেই কত আনন্দ আর আজ আমার শহুরে ছেলের বউ গাছে ছাওয়া পথটুকু দেখে যে এত খুশি হলো তাতে আমার সুপারি গাছের দাম আরও বেড়ে গেল।

তবে আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হলো না ওরা অসুস্থতার কারণে। চারদিনের মাঝে একদিনও গোসল হয়নি। ফেরার দিনে ননদ খোঁচা দিয়ে বললো, আমাদের বাঁশের বেড়ার কলতলা আর টিপকল দেখেই তোমার শহুরে ছেলের বউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কথাটি সামান্য তবে এর অর্থ যে এত গভীর তা হিশাম বুঝেছিল পরে।

বোনের বিয়ের আয়োজন করতে মাসখানেক পর আবার পটুয়াখালী এসে হিশাম বুঝল ছোটবোনটি নেতিবাচক চোখেই মাহীনকে বিচার করে খুব নাখোশ তার ওপর। নানা অভিযোগ। বড়লোক, শহুরে মেয়েরা নাকউঁচু হয়। গোসল করার ভয়ে জ্বর উঠিয়ে এসেছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে হিশাম মায়ের মৃদু আপত্তি ঝাঁঝের মুখে টিকল না। আদরের বোনের মনের কূটিলতা আর জটিলতা দেখে হিশাম হতবাক। দুইদিন পর বিয়ে হয়ে চলে যাবে। ওর এখন দরকার স্নেহের বাক্য। ওকে এই সময় কঠিন কথা বলে ভুল ভাঙ্গানোর চেষ্টা কর। মাহীনের দেয়া মূল্যবান জরোয়ার গহনা পেয়েও মন উঠল না বোনের। হিশামের মা ছেলের বউয়ের পাঠানো উপহার দেখে ভেজা চোখে বললেন, ‘এত দামী’ জিনিস দিয়েছি। তুই বাবা টাকা পয়সা জড়ো করতে পারলে একদিন ঐ মেয়েকে খুবই দামী হীরার একটা আংটি কিনে দিস আর বলিস ও যেন সবসময় আঙ্গুলে পরে থাকে। হিশামের বোন বিরক্তি নিয়ে বলেছিল ‘যে এত দামী জরোয়ার গয়না সহজে অন্যকে দান করে তার কাছে হীরার কিইবা মূল্য, তুমি না মা বেশি বেশি...।’

হিশাম জানতো মাহীন তার নতুন সেরা গয়নাটিই ননদকে দিয়েছে। বোনের বিয়ের তারিখ পড়ল মাহীনের অনার্স পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে। যৌক্তিক কারণে বিয়েতে আসা হয়নি তার। এ নিয়েও প্রচুর কথা উঠল।

তারপরই মাহীনের মা অসুখে পড়লেন। রোগভোগ দীর্ঘ হলো। মাহীনরা ভাড়া বাড়ি ছেড়ে মায়ের বাসায় চলে এলো। পরে তো মা মারাও গেলেন। তার একমাত্র মেয়ে। সেই তার রোগশোকের সমব্যথী। এমএ পড়াও শেষ হলো না মায়ের দেখাশুনা করতে গিয়ে। বাবার চারতলা বাড়ির ছয় ফ্ল্যাটের ভাড়া মন্দ আসত না। তবুও চিকিৎসা চালানো জন্য ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হলো। সে সময় বাবার একমাত্র ফুপাত ভাই যিনি নিজেও মাহীনের পুত্রসন্তানহীন বাবার সম্পত্তির একজন উত্তরাধিকার এই শক্তিতে কম নষ্টামি করেনি। এই নিয়েও নানা ধরনের উল্টাপাল্টা অভিযোগে বিপর্যস্ত হলো মাহীন। একমাত্র

সন্তান হিসাবে অসুস্থ মাকে দেখার দায়িত্ব মাহীনের এই সত্যটা স্বামী ও শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ মানতে চাইল না। কেন সে অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী মাকে ফেলে ননদের বাচ্চার আকিকাতে গেলেন না তার জন্যও অভিযুক্ত হলো। নিজে যেতে পারবে না বলে শাশুড়ির চোখ অপারেশন করাতে ঢাকাতে নিয়ে এসেছিল। তাতে দুই পক্ষের সবাই অখুশি। মাহীনের চাচা তো মন ভার করে বলেই ফেললেন।

‘নিজ মায়ের জন্য খরচ না হয় মানা যায় শাশুড়ির জন্য অযথা টাকা খরচ কেন?’

শুনে তখন শাশুড়ি বলেছিলেন ‘মা, মানুষের কথায় মন খারাপ করো না, তোমাদের আর্থিক ক্ষমতা আছে বলেই মা চিকিৎসা করাচ্ছ, আমার চোখেরও অপারেশন করালে। আমার ক্ষমতা থাকলে আমিও হয়তো আমার বাবার চোখ সারিয়ে তুলতাম। তাকে অন্ধ হয়ে মরতে হতো না। মেয়েদের ক্ষমতা বড় কম হয়রে মা। মাকে দেখভাল করছিল এই তার অপরাধ। মাহীন ছেলে হলে এই প্রশ্ন কেউ তুলতো না। সবার ধারণা মা-বাবাকে দেখার দায়িত্ব মেয়েদের নয়, ছেলের। চাচা তো কুৎসা রটালেন যে মাহীনের স্বামী লোভী, সে শ্বশুড়বাড়ি দখলের মতলবে আছে। মানুষের অসহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠুর অভিযোগে বিপর্যস্ত মাহীন ধীরে ধীরে বিষণœ আর চুপচাপ হয়ে গেল। ইত্যাদি কারণে ওরা দেশত্যাগ কররর সিদ্ধান্ত নেয়। হৃদয়বান হিশাম দেশ ছাড়লেও বরাবরই দেশে আসা আপনজনদের প্রতি নানা কর্তব্যের পাকে জড়িত ছিল। বিদেশ বাস করেও খুব দামী হীরার আংটি কেনার মতো অর্থ সঞ্চিত হয়নি তার। তবে মেয়েকে হিশাম বলেছিল আরও কিছু টাকা জমলে একদিন ওকে নিয়েই দামী হীরার আংটিটি কিনে আনবে মাহীনের জন্য।

- See more at: https://www.dailyjanakantha.com/details/article/201213/গল্প-অবাক-কাণ্ড#sthash.ErNaI2rD.dpuf